ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ঈমান

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রহঃ)

প্রশ্ন: (৬৫) সম্মানিত শাইখ! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, (لا عدوى ولاطيرة ولا هامة ولا صفر) “একজনের রোগ অন্যজনের শরীরে সংক্রমিত হয় না। পাখী উড়িয়ে বা পাখীর ডাক শুনে কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণের নিয়ম ইসলামে নেই। সফর মাসকেও অশুভ মনে করাও ঠিক নয়। এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা জানতে চাই। হাদীসে বর্ণিত জিনিসগুলোর প্রভাবকে অস্বীকার করা হয়েছে। এগুলো কোনো ধরণের অস্বীকার? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, “কুষ্ঠ রোগী থেকে পলায়ন কর যেভাবে তুমি বাঘ থেকে ভয়ে পলায়ন কর”। এ হাদীস ও প্রথমোক্ত হাদীসের মধ্যে কীভাবে সমন্বয় করব?

উত্তর: একজনের রোগ অন্যজনের শরীরে সংক্রমিত হওয়াকে আদওয়া বলা হয়। শারীরিক রোগে যেমন এটা হয়, তেমনি চারিত্রিক রোগের ক্ষেত্রেও এমন হয়ে থাকে। এ জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অসৎ বন্ধু কামারের ন্যায়। সে হয়ত তোমার জামা পুড়িয়ে ফেলবে। তা না হলে কমপক্ষে তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে।

কোনো জিনিস দেখে, কোনো কথা শুনে বা জানার মাধ্যমে কুলক্ষণ মনে করাকে ‘ত্বিয়ারা’ বলা হয়।

‘হামাহ’ এর ব্যাখ্যা দু’ধরণ হতে পারে।

ক) এমন রোগ, যা একজনকে আক্রমণ করে অন্যজনের নিকট সংক্রমিত হয়।

খ) ‘হামাহ’ বলা হয়, আরবদের ধারণামতে এমন এক শ্রেণির পাখিকে, যে গভীর রাতে নিহত ব্যক্তির বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তার পরিবারের লোকদেরকে ডাকাডাকি করে এবং প্রতিশোধ নেওয়ার উৎসাহ দেয়। কেউ কেউ ধারণা করে যে, এটি নিহত ব্যক্তির রূহ পাখির আকৃতি ধরে উপস্থিত হয়েছে। এ পাখিটিকে আমাদের পরিভাষায় হুতুম পেঁচা বলা হয়। তৎকালিন আরবরা এ পাখির ডাককে কুলক্ষণ মনে করত। কারো ঘরের পাশে এসে এ পাখি ডাকলে তারা বিশ্বাস করত যে, সে মৃত্যু বরণ করবে।

‘সফর’ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(১) আরবী সফর মাস। আরবরা এ মাসকে অকল্যাণের মাস মনে করত।

(২) এটি উটের এক ধরণের রোগের নাম, যা এক উটের শরীর থেকে অন্য উটের শরীরে সংক্রমিত হয়।

(৩) সফর মাসকে আরবরা কখনো হারাম মাসের সাথে গণনা করত। আবার কখনো হালাল মাস হিসাবে গণ্য করত। এটি আরবদের গোমরাহী মূলক একটি আচরণ।

তবে উল্লিখিত ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে গ্রহণযোগ্য কথা হলো, জাহেলী সমাজের লোকেরা সফর মাসকে অমঙ্গলের মাস মনে করত। মূলতঃ কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণে সময় বা মাসের কোনো প্রভাব নেই। ছফর মাস অন্যান্য মাসের মতই। তাতে কল্যাণ-অকল্যাণ আল্লাহর নির্ধারণ অনুযায়ীই হয়ে থাকে।

উপরে বর্ণিত ভ্রান্ত বিশ্বাস খন্ডন করতে গিয়ে কোনো কোনো মানুষ যখন ছফর মাসে কোনো কাজ সমাধা করে, তখন সেই তারিখ লিখে রাখে এবং বলে কল্যাণের মাস ছফর মাসের অমুক তারিখে কাজটি সমাধা হল। এটি এক বিদ‘আত দ্বারা অন্য বিদ‘আতের এবং এক অজ্ঞতা দ্বারা অন্য অজ্ঞতার চিকিৎসা করার শামিল। এটি কল্যাণের মাসও নয় এবং অকল্যাণের মাসও নয়। এ জন্যই কোনো কোনো বিদ্বান পেঁচার ডাক শুনে (خيرا ان شاء الله) “আল্লাহ চাহেতো ভালো হবে” এ কথা বলার প্রতিবাদ করেছেন। ভালো বা খারাপ কোনো কিছুই বলা যাবে না। সে অন্যান্য পাখির মতোই ডাকে।

উপরের চারটি বিষয়ের প্রভাবকে হাদীসে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় আল্লাহর ওপর ভরসা করা সকল মুমিনের ওপর আবশ্যক। এতে ঈমান মজবুত হবে। এ সমস্ত কুসংস্কারের সামনে মুমিন ব্যক্তি কখনো দুর্বল হবে না।

কোনো মুসলিম ব্যক্তি যখন এ সমস্ত বিষয়ের প্রভাবকে বিশ্বাস করবে, তখন নিম্নলিখিত দু’অবস্থার এক অবস্থা হতে পারেঃ

(১) সে হয়ত বিশ্বাস করে সামনের দিকে অগ্রসর হবে অথবা থেমে যাবে। এ অবস্থায় তার কর্মসমূহ এমন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করল, যার কোনো প্রভাব নেই।

(২) কোনো কিছু পরওয়া না করে কাজের প্রতি অগ্রসর হবে, কিন্তু মনের ভিতরে দুর্বলতা ও দুশ্চিন্তা থেকেই যাবে। কিন্তু এটি প্রথমটির চেয়ে হালকা। কারণ, সে এ সমস্ত বিষয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করে থাকে।

কিছু কিছু মানুষ শুভ-অশুভ নির্ধারণ করার জন্য কুরআন মাজীদ খুলে থাকে। খুলে জাহান্নামের আলোচনা দেখতে পেলে লক্ষণ ভালো নয় বলে মনে করে। আর জান্নাতের আলোচনা দেখতে পেলে খুশী হয়। এটি জাহেলী যামানার লোকদের কাজের মতই। যারা জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণ করত।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত জিনিসগুলোর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেননি। কারণ, এগুলোর অস্তিত্ব রয়েছে। তবে এগুলোর প্রভাবকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেনে নেন নি। আল্লাহই সকল বস্তুর ওপর প্রভাব বিস্তারকারী। সুতরাং যদি জানা যায় যে, কোনো বস্তু সংঘটিত হওয়াতে সঠিক কারণ রয়েছে, তাহলে তাকে কারণ হিসাবে বিশ্বাস করা বৈধ। কিন্তু নিছক ধারণা করে কোনো ঘটনায় অন্য বস্তুর প্রভাব রয়েছে বলে বিশ্বাস করা ঠিক নয়। কোনো বস্তু নিজে নিজেই অন্য ঘটনার কারণ হতে পারে না। সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “অসুস্থ উটের মালিক যেন সুস্থ উটের মালিকের উটের কাছে অসুস্থ উটগুলো নিয়ে না যায়।”[1] সুস্থ উটগুলো অসুস্থ হয়ে যাওয়ার ভয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রকম বলেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

«فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ»

“সিংহের ভয়ে তুমি যেমন পলায়ন কর, জুযাম (কুষ্ঠ) রোগী দেখেও তুমি সেভাবে পলায়ন কর”।[2]

আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুষ্ঠ রোগী থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। এখানে রোগের চলমান শক্তির কথা স্বীকার করা হয়েছে। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্কতা অবলম্বনের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

«وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»

“তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৯৫] এটা বলা যাবে না যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগের সংক্রমন হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। কেননা বাস্তব অবস্থা ও অন্যান্য হাদীসের মাধ্যমে এ রকম ধারণাকে খন্ডন করা হয়েছে।

যদি বলা হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বললেন, রোগ সংক্রামিত হয় না, তখন একজন লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! মরুভূমিতে সম্পূর্ণ সুস্থ উট বিচরণ করে। উটগুলোর কাছে যখন একটি খুজ্লিযুক্ত উট আসে, তখন সব উটই খুজ্লিযুক্ত হয়ে যায়। তিনি বললেন, প্রথম উটটিকে কে খুজ্লিযুক্ত করল?[3]

উত্তর হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি “প্রথমটিকে কে খুজলিযুক্ত করল?” এর মাধ্যমেই জবাব দিয়েছেন। আল্লাহর ইচ্ছাতেই রোগের জীবানু অসুস্থ ব্যক্তির নিকট থেকে সুস্থ ব্যক্তির নিকট গমণ করে থাকে। তাই আমরা বলব যে, প্রথম উটের উপরে সংক্রামক ব্যতীত আল্লাহর ইচ্ছাতেই রোগ নাযিল হয়েছে। কোনো ঘটনার পিছনে কখনো প্রকাশ্য কারণ থাকে। আবার কখনো প্রকাশ্য কোনো করণ থাকে না। প্রথম উট খুজ্লিযুক্ত হওয়ার পিছনে আল্লাহর নির্ধারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণ পাওয়া যাচ্ছে না। দ্বিতীয় উট খুজলিযুক্ত হওয়ার কারণ যদিও জানা যাচ্ছে, তথাপি আল্লাহ চাইলে খুজলিযুক্ত হত না। তাই কখনো খুজলিতে আক্রান্ত হয় এবং পরবর্তীতে ভালোও হয়ে যায়। , কলেরা এবং অন্যান্য সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রেও একই কথা। একই ঘরের কয়েকজন আক্রান্ত হয়। কেউ মারা যায় আবার কেউ রেহাই পেয়ে যায়। মানুষের উচিৎ আল্লাহর ওপর ভরসা করা। বর্ণিত আছে যে, ‘একজন কুষ্ঠ রোগী লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসল। তিনি তার হাত ধরে বললেন, আমার সাথে খাও।’[4] আল্লাহর ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও ভরসা থকার কারণেই তিনি তাকে খানায় শরীক করেছিলেন।

উপরের বিরোধপূর্ণ হাদীসগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধানে যা বলা হলো, তাই সর্বোৎকৃষ্ট। কেউ কেউ প্রশ্নের শেষোক্ত হাদীসকে মানসুখ বা রহিত বলেছেন। রহিত হওয়ার দাবী ঠিক নয়। কেননা রহিত হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো বিরোধপূর্ণ হাদীসের মধ্যে সমঝোতা করা সম্ভব না হওয়া। উভয় হাদীসের মধ্যে মিল দেওয়া সম্ভব হলে উভয় হাদীসের উপর আমল করতে হবে। আর রহিত হওয়ার দাবী করলে এক পক্ষের হাদীসের ওপর আমল বাতিল হয়ে যায়। এক পক্ষের হাদীসগুলো বাতিল করার চেয়ে উভয় পক্ষের হাদীসগুলোর ওপর আমল করাই উত্তম।

ফুটনোট

[1] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুত্ তিবব।

[2] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুত্ তিবব।

[3] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুত্ তিবব।

[4] আবু দাউদ, অধ্যায়: কিতাবুত্ তিবব।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=597

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন